বিপ্লবের দুই ধারা

বিপ্লব তত্ত্ব

কোন অঞ্চলে বিপ্লবের মাধ্যমে কিভাবে বিদ্যমান শাসককে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করা হবে তা নিয়ে **দুটি উল্লেখযোগ্য মডেল আছে** –

- জনযুদ্ধ (People's War/Guerilla Warfare)
- বিপ্লব (গণঅভ্যুত্থান অথবা সশস্ত্র অভ্যুত্থান)

জনযুদ্ধ: প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া। দীর্ঘমেয়াদী এবং ধাপে ধাপে পরিচালিত প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করা হয়।

বিপ্লব: বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি হয়ে গেলে গণঅভ্যুত্থান, রাজপথ দখল, সশস্ত্র বিদ্রোহ অথবা এগুলোর মিশ্রনে শাসনক্ষমতা দখল। বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয় একটি কেন্দ্রীভূত সুশৃঙ্খল ভ্যানগার্ড। রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দেয়ার পর আকস্মিক আঘাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হয়। প্রথমে ক্ষমতার কেন্দ্র (শহর/রাজধানী) দখল করা, তারপর ধাপে ধাপে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।

বিপ্লব কিভাবে? (Revolutionary Models)

এ দুই মডেলের অধীনে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করার প্রক্রিয়া নিয়ে নিচে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

ক) গেরিলা যুদ্ধ বা জনযুদ্ধ:

একটি সশস্ত্র ভ্যানগার্ড প্রাথমিক পর্যায়ে গেরিলা বাহিনী গড়ে তুলবে। গেরিলা বাহিনীর জন্য একটি নিরাপদ অঞ্চল/ঘাঁটি এলাকা (সেইফ হ্যাভেন) নির্বাচন করা হবে, যেখানে স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে কিছুটা প্রাথমিক সমর্থন পাওয়া যাবে। এই অঞ্চল হতে হবে দুর্গম, সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বাইরে, যেখানে সহজে মানুষ এবং রসদ আনা-নেওয়া করা যায়। এই অঞ্চলে গেরিলা বাহিনী তাদের কার্যক্রম শুরু করবে এবং স্থানীয় জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে। তাদের চাহিদা ও সমস্যা বুঝে সমাধান প্রদানের মাধ্যমে জনসাধারণের আস্থা অর্জন করা হবে।

ঘাঁটি অঞ্চলকে ব্যবহার করে গেরিলা বাহিনী সংগঠিত ও প্রশিক্ষিত হবে। তারপর **সরকারের কেন্দ্রীভূত শক্তির আওতার বাইরের কোন অঞ্চলে সামরিক হামলা শুরু করবে। অর্থাৎ, সহজ ভাষায় বললে, দুর্গম, প্রত্যন্ত অঞ্চলে গেরিলা হামলা করবে।** শুরু হবে গেরিলা ক্যাম্পেইন।

এসব হামলার উদ্দেশ্য,

- প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সরকারকে পিছু হটানো, এবং সেখানে তামকীন প্রতিষ্ঠা
- তারপর সেখানে ছায়া প্রশাসন স্থাপন করে শাসন পরিচালনা
- তারপর ধীরে ধীরে এই অঞ্চলের পরিধি বৃদ্ধি
- ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে কেন্দ্রের (রাজধানী) দিকে আসা।
- শেষ পর্যায়ে কেন্দ্র দখল
- সব শেষে আগের সরকারের পতন এবং গেরিলাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল।

ক্রমাগত আঘাতের মাধ্যমে সরকারের প্রশাসনিক ও সামরিক কাঠামো দুর্বল করা হবে। শাসকের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়া এলাকাগুলোতে গঠন করা হবে বিকল্প শাসন কাঠামো, যা জনগণের কাছে শাসনের নতুন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করবে। যুদ্ধের মধ্য

দিয়েই জনসমর্থন বাড়ানো হবে। যুদ্ধের মাধ্যমে জনগণকে বিপ্লবী চিন্তাধারার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। দখল করা অঞ্চলে গেরিলারা স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা দেয়ার (অরাজকতার ব্যবস্থাপনা) চেষ্টা করবে। গেরিলারা চেষ্টা করবে তাদের আদর্শ এবং আচরণের মাধ্যমে জনগণের মন ও মগজ জয় করার।

গেরিলা আক্রমণ ক্রমশ শাসকগোষ্ঠীর মনোবল ভেঙে দেবে এবং প্রশাসনিক কার্যক্ষমতা অচল করে দেবে। একের পর এক অঞ্চল দখলের মাধ্যমে গেরিলারা তাদের প্রভাব বিস্তার করবে। ধীরে ধীরে সীমান্ত বা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া হবে।

শেষ পর্যায়ে গেরিলারা রাষ্ট্রের প্রতীকী ও কৌশলগত স্থাপনাগুলো (যেমন রাজধানী বা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ভবন) দখল করবে এবং সরকারকে উৎখাত করা হবে। সরকারের পতন নিশ্চিত হলে বিপ্লবী আদর্শ অনুযায়ী একটি নতুন শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

উদাহারণ: চীনা বিপ্লব, তালেবানের ক্ষমতা দখল (২০২১) ইত্যাদি।

খ) বিপ্লব(গণঅভ্যুত্থান/সশস্ত্র অভ্যুত্থান):

এই মডেল শহরকেন্দ্রিক গণঅভ্যুত্থান এবং জনসম্পৃক্ততার উপর নির্ভরশীল। জনগণকে রাস্তায় এনে রাষ্ট্রকে অচল করে দিয়ে, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আকস্মিক আঘাতের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এই পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। এই মডেলের মৌলিক দিকগুলো হলো জনগণের সাথে সরাসরি সংযোগ, তাদের প্রয়োজন এবং সমস্যার সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা, এবং ধাপে ধাপে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি করে শাসকগোষ্ঠীকে দুর্বল করা।

এ পদ্ধতিতে প্রথমে জনগণের সামনে বিপ্লবী আদর্শ এবং বিপ্লব পরবর্তী ব্যবস্থার ভিশন/চিত্র তুলে ধরতে হবে। বিদ্যমান শাসনব্যবস্থার অসারতা সম্পর্কে সচেতন করা হবে। জনমানুষকে বিপ্লবীদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা হবে। বিপ্লবীদের আদর্শের সাথে বিদ্যমান কাঠামোর দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করতে হবে সমাজের মূল দ্বন্দ্ব হিসেবে।

বিপ্লবী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে আদর্শিক প্রচারণার পাশাপাশি সামাজিক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক প্রচারণা ইত্যাদি জরুরী। ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক, কৃষক, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বসহ সমাজের বিভিন্ন অংশকে বিপ্লবী আদর্শ ও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। নিদেনপক্ষে সমর্থকে পরিণত করতে হবে।

ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে সমাজে মেরুকরণ ঘটানো হবে। বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা, আবশ্যকতা, নৈতিকতার বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা হবে। ধীরে ধীরে আন্দোলনের সক্ষমতা ও অভিজ্ঞতা তৈরি করতে হবে। চূড়ান্ত আন্দোলন শুরুর আগেই জনসাধারণকে প্রস্তুত করতে হবে। প্রচারণা, এবং জনগণকে সংগঠিত করায় মুখ্য ভূমিকা রাখবে বিপ্লবীদের অগ্রবর্তী দল বা ভ্যানগার্ড।

চূড়ান্ত আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে শান্তিপূর্ণ মিছিল, সমাবেশ, এবং পিটিশন জমা দেয়া জাতীয় কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশাসনের ব্যর্থতা জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে। কর্মসূচী ধীরে ধীরে তীব্রতর হবে। মানুষকে সম্পৃক্ত করে গণজমায়েত করতে হবে, রাস্তায় মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে ক্রমশ।

- বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনী বা সুরক্ষা কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিপ্লবের ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে। এসব কমিটি স্থানীয় পর্যায়ে আন্দোলন পরিচালনা করবে এবং জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ এনগেইজমেন্ট রাখবে, জনগণকে মৌলিক কিছু বিষয়ে সাহায্য করবে - যেমন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- পাশাপাশি, ধর্মঘট বা ঘেরাও কমিটি গঠন করে পরিবহন, বিদ্যুৎ, এবং যোগাযোগ খাতকে অচল করার পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

- শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো, যেমন বাসস্টেশন, রেলস্টেশন, ব্যাংক, এবং সরকারি অফিস অবরোধ করে প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত করা হবে।

এভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দেয়া হবে। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রন অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে। এ পরিস্থিতিতে উপযুক্ত সময়ে আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুত্থান বা গণঅভ্যুত্থানের (চূড়ান্ত ঘেরাও) দিকে অগ্রসর হবে।

শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে গণজোয়ার ও ঘেরাওয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত কর্মসূচী দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে হবে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে বিপ্লবের জন্য সশস্ত্র পদক্ষেপের সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে দুটি অক্ষ থাকবে— একটি বেসামরিক, আরেকটি সশস্ত্র। বেসামরিক অক্ষ তথা গণঅভ্যুত্থান/দেশ অচল করার দায়িত্ব পালন করবে। সশস্ত্র অক্ষের মাধ্যমে চূড়ান্ত আঘাত হানা হবে।

- সশস্ত্র দল এবং গণজোয়ারের মধ্যে সমন্বয় রেখে পরিকল্পনা করা হবে, যেন প্রতিটি আক্রমণ কৌশলগতভাবে কার্যকর হয়।

- সশস্ত্র অপারেশন অথবা ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতীকী স্থাপনাগুলো দখল করা হবে: যেমন গণভবন, সংসদ, সচিবালয়, সংবাদমাধ্যম, প্রশাসনিক ভবন, অর্থনৈতিক কেন্দ্র ইত্যাদি। যার ফলে সরকারের পতন ঘটবে।

গণবিপ্লবের অন্যতম প্রধান দিক হলো সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আন্দোলনের শক্তি বাড়ায় এবং প্রশাসনিক ও সামরিক বাহিনীর মনোবল ভেঙে দেয়। বিপ্লবী ভ্যানগার্ড সমন্বিতভাবে এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং জনগণের সঙ্গে সরাসরি সমন্বয় স্থাপন করে।

শাসনব্যবস্থার পতন নিশ্চিত হলে দ্রুত অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার প্রথমে খাদ্য সরবরাহ, আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, এবং জনসেবা পুনরায় চালু করার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করে। তারপর একটি নতুন শাসন কাঠামো প্রণয়ন করা হয়, যা বিপ্লবী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

উদাহরণ: রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, ইরানের শিয়া বিপ্লব।

বিপ্লবের দুই মডেল
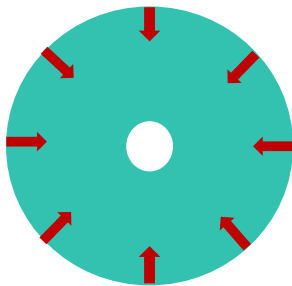
জনযুদ্ধ/গেরিলা যুদ্ধ
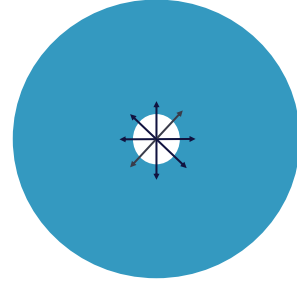
অভ্যুত্থান

গেরিলা যুদ্ধ/জনযুদ্ধ এবং বিপ্লবের (গণঅভ্যুত্থান/সশস্ত্র অভ্যুত্থান) মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্যঃ

বিষয়	গেরিলা যুদ্ধ (জনযুদ্ধ)	বিপ্লব (গণঅভ্যুত্থান/সশস্ত্র অভ্যুত্থান)
মূল ধারণা	প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ধাপে ধাপে শহরের দিকে অগ্রসর হওয়া।	শহরকেন্দ্রিক গণঅভ্যুত্থান বা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল।
কৌশলগত দিক	দীর্ঘমেয়াদী গেরিলা যুদ্ধ, যেখানে সরকারকে ধীরে ধীরে দুর্বল করা হয়।	আকস্মিক ও তীব্র আঘাতের মাধ্যমে রাষ্ট্রযন্ত্রকে অচল করে দেয়া হয়।
প্রক্রিয়া	➢ নিরাপদ ঘাঁটি স্থাপন ➢ গেরিলা বাহিনী সংগঠন ➢ প্রত্যন্ত অঞ্চলে আক্রমণ ➢ ছায়া প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ➢ কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়া ➢ রাজধানী দখল	➢ বিপ্লবী আদর্শ প্রচার ➢ গণসংগঠন গড়ে তোলা ➢ জনমত তৈরি ও মেরুকরণ ➢ আন্দোলনের সামর্থ্য ও অভিজ্ঞতা ➢ চূড়ান্ত আন্দোলনে প্রবেশ (বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উপস্থিতিতে) ➢ ক্রমাগত আন্দোলন তীব্র করা ➢ রাষ্ট্রযন্ত্র অচল করা ➢ চূড়ান্ত আঘাত ও ক্ষমতা দখল
ভ্যানগার্ডের ভূমিকা	সশস্ত্র গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দেয় এবং সামরিক কৌশল নির্ধারণ	কেন্দ্রীভূত সুশৃঙ্খল দল আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় এবং কৌশলগত পরিকল্পনা করে।
বিপ্লবী শ্রেণী	সাধারণত গ্রামীণ কৃষক ও স্থানীয় জনগণ।	শহরের শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।
গণসমর্থন অর্জন	যুদ্ধের মাধ্যমে জনগণের আস্থা ও সমর্থন অর্জন করা হয়।	আদর্শিক প্রচারণা ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনসমর্থন তৈরি করা হয়।
সংগঠন গঠন	ছায়া প্রশাসন ও স্থানীয় শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা।	গণসংগঠন, ধর্মঘট কমিটি, এবং প্রতিরোধ কমিটি গঠন।
সশস্ত্র অক্ষ	গেরিলা বাহিনী, যারা দীর্ঘমেয়াদী সশস্ত্র সংগ্রাম চালায়।	সশস্ত্র দল ও গণজোয়ারের সমন্বয়ে চূড়ান্ত আঘাত হানা হয়।
সময়কাল	দীর্ঘমেয়াদী, সাধারণত বহু বছর ধরে চলতে পারে।	স্বল্পমেয়াদী, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দ্রুত ক্ষমতা দখল করা হয়।
অঞ্চল	দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু হয়।	শহর ও রাজধানী কেন্দ্রিক।
আঘাতের ধরন	ক্রমাগত আক্রমণের মাধ্যমে সরকারকে ধীরে ধীরে দুর্বল করা।	আকস্মিক ও সরাসরি আঘাতের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করা।
উদাহরণ	চীনা বিপ্লব, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, তালেবানের ক্ষমতা দখল (২০২১)।	রুশ বলশেভিক বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব, ইরানের শিয়া বিপ্লব।

বিপ্লবের কিছু অপরিহার্য উপাদান:

১. ভ্যানগার্ড: ভ্যানগার্ড (Vanguard) শব্দের শাব্দিক অর্থ অগ্রদূত/অগ্রগামী দল। বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এটি সুশৃঙ্খল, আদর্শিকভাবে দৃঢ়, পেশাদার বিপ্লবী। সংখ্যায় অল্প। সঠিক আদর্শ (আকীদাহ-মানহাজ-ফিকির) ধারণকারী এবং এর সংরক্ষক। এই শ্রেনী বিপ্লবের বাকি উপাদানগুলোকে নিয়ন্ত্রন করবে, সংগঠিত করবে দিকনির্দেশনা দিবে।

ভ্যানগার্ডের ভূমিকা হলো জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার করা এবং তাদের নেতৃত্ব দিয়ে আন্দোলনের অভিমুখ সুনিশ্চিত করা। ভ্যানগার্ড এমন একটি কাঠামো তৈরি করে যেখানে সাধারণ জনগণ আন্দোলনের সক্রিয় অংশ হয়ে ওঠে। তারা জনসমর্থনকে সংগঠিত করে এবং তাদের দিকনির্দেশনা দেয়, কিন্তু জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে স্তিমিত না করে। ভ্যানগার্ড এবং জনতার সমন্বয়ই বিপ্লবের সফলতার চাবিকাঠি।

ভ্যানগার্ডের দায়িত্ব:

- আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়া।
- সঠিক আকীদাহ (আদর্শ) ও মানহাজ (পদ্ধতি) বিশুদ্ধভাবে ধারণ করা, এবং একে মিশ্রিত, বা কলুষিত হওয়া থেকে রক্ষা করা।
- বিপ্লবের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা।
- সঠিক আকীদাহ, মানহাজের আলোকে একটি রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং তা অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা। সুনির্দিষ্ট ও ডিটেইলড রূপ দেয়া।
- বিল্পবী শ্রেনীকে চিহ্নিত করা, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ ও সক্রিয় করে তোলা।
- শাসন ক্ষমতা দখলের জন্য রাজনৈতিক এবং সামরিক কৌশল নির্ধারণ করা।
- জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তাধারা প্রচার।
- শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, এবং মধ্যবিত্তসহ বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে নেতৃত্ব ও সম্পৃক্ততা তৈরি।

২.বিপ্লবী শ্রেনী: সমাজের সেই অংশ যাদের উপর ভিত্তি করে বিপ্লব পরিচালিত হয়। পরিবর্তনের প্রাথমিক চালিকাশক্তি। বিপ্লবী শ্রেনী হল সমাজের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট শ্রেনী, যারা বৈপ্লবিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। বিপ্লবটাকে তারা তাদের নিজেদের বিপ্লবই মনে করবে। প্রাথমিক মোবালাইযেইশান তাদের মধ্য থেকে হবে। কমিউনিস্টদের মতে বিপ্লবী শ্রেনী হল সর্বহারা বা প্রলেতারিয়েত। রাশিয়ার বিপ্লবে সর্বহারা ছিল শিল্প খাতের শ্রমিক শ্রেনী। চীনের বিপ্লবের সর্বহারার ভূমিকায় ছিল কৃষক শ্রেনী।

বিপ্লবী শ্রেনীর মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা তৈরি হলে, তারা বিভিন্ন গণসংগঠন গড়ে তোলা এবং এগুলোর বিস্তারে কাজ করবে। একইসাথে তারা জনমুখী প্রচারনা চালাতে থাকবে। যাতে বিপ্লবের পক্ষে জনসমর্থন তৈরি হতে থাকে। বিপ্লবী শ্রেণী শুধু আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু নয়; তাদের দায়িত্ব হলো বাকি জনগণকে বিপ্লবী ধারণার সাথে সম্পৃক্ত করা। এটি করা হয় বিভিন্ন গণসংগঠন গঠনের মাধ্যমে, যেখানে শ্রমিক, কৃষক, এবং ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিপ্লবী শ্রেণীর কাজ হলো জনসাধারণের বৈপ্লবিক চেতনার উন্নয়ন ঘটানো, যা পরে গণআন্দোলনে রূপ নেয়।

বিপ্লবী শ্রেনীর ভূমিকা:

- গণআন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু: বিপ্লবী শ্রেণির মাধ্যমেই প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মঘট, বিক্ষোভ, এবং অন্যান্য আন্দোলন তৈরি হয়।
- সংহতি বজায় রাখা: বিপ্লবী শ্রেণি নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখে এবং আন্দোলনকে টিকিয়ে রাখে।

- শ্রমিক ইউনিয়ন এবং ধর্মঘট কমিটি ইত্যাদি মাধ্যমে সংগঠনের ভিত্তি মজবুত করে।

৩. গণজোয়ার (Mass Mobilization):

বিপ্লব সফল করতে সাধারণ জনগণের সমর্থন অপরিহার্য। সাধারণ মানুষের একটি অংশকে বিপ্লবের সমর্থকে পরিণত করতে হবে। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে তারা রাস্তায় নেমে আসবে, একাত্মতা ঘোষণা করবে। জনগণকে কর্মসূচীতে যুক্ত করার জন্য বহুল ব্যবহৃত কিছু কৌশল—

- সংবাদপত্র, লিফলেট, এবং জনসভা ব্যবহার করে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।
- সরকার ও শাসকগোষ্ঠীর দুর্নীতি এবং ব্যর্থতা প্রকাশ করা।
- শহরের প্রধান এলাকায় বিক্ষোভ এবং গণসমাবেশের মাধ্যমে জনগণকে রাস্তায় নামানো।
- সাধারণ মানুষের সমর্থনকে আন্দোলনের শক্তিতে রূপান্তরিত করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিরোধ কমিটি এবং ধর্মঘট কমিটি গঠন করে জনগণকে বিপ্লবের অংশ বানানো।

৪. সশস্ত্র অক্ষ: চূড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা দখলের পর তার কনসোলিডেশন, পুরনো কাঠামো ভাঙ্গা এবং প্রতিবিপ্লব ঠেকানোর জন্য সশস্ত্র সামর্থ্য অর্জন।

৫. বৈপ্লবিক পরিস্থিতি: শুধু ইস্যু, গণসংগঠন এবং সশস্ত্র আঘাতের সামর্থ্য থাকা যথেষ্ট না। বিভিন্ন ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে প্ররোচিত করতে হবে। মেরুকরণ চালাতে হবে। পাশাপাশি দাওয়াতি, প্রশিক্ষণ, তরবিয়তি, ফিকরি, সিয়াসি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী চলতে থাকবে। এভাবে উপযুক্ত বৈপ্লবিক পরিস্থিতি উদ্ভূত হলেই কেবল গণঅভ্যুত্থানের প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে, এর আগে না।

বিপ্লবের দুটি পর্যায়

গণবিপ্লব-গণঅভ্যুত্থান দুটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত—

- **ওয়ার অফ পযিশন (War of Position)**
- **ওয়ার অফ ম্যানুভার (War of Maneuver)**

এই পর্যায়গুলো বিপ্লবী কৌশলের ধাপে ধাপে বিকাশ এবং চূড়ান্ত সফলতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

১) ওয়ার অফ পজিশন (War of Position):

এই পর্যায় বিপ্লবের ভিত্তি তৈরি করার। এ পর্যায় দীর্ঘমেয়াদী, এবং এর উপর বিপ্লবী পরিস্থিতি তৈরি হওয়া এবং তা কাজে লাগানোর সক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এ পর্যায়ে সরাসরি রাষ্ট্রের সাথে সংঘাতে যাওয়া হবে না। বরং মাঠ তৈরির কাজ চলবে। এটি জমিতে লাঙ্গল দেয়ার পর্যায়। এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া।

এ পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজ:

- বিদ্যমান ব্যবস্থার আদর্শিক ভিত্তি দুর্বল করা
- মানুষকে গোলাম বানিয়ে রাখা সামাজিক আধিপত্য (কালচারাল হেজেমনি) ভাঙ্গা

- বিপ্লবী আদর্শের প্রচার
- জনগণের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা তৈরি করা
- বিপ্লবী শ্রেনীকে সংগঠিত করা
- সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে সম্পৃক্তি
- গণসংগঠন তৈরি
- আন্দোলনের সামর্থ্য অর্জন
- বিদ্যমান ব্যবস্থা এবং বিপ্লবীদের আদর্শের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে সমাজের প্রধান প্রশ্ন ও দ্বন্দ্বে পরিণত করা
- প্রধান দ্বন্দ্বের ভিত্তিতে মেরুকরণ।

২) ওয়ার অফ ম্যানুভার (War of Maneuver): ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। এ পর্যায়ে চূড়ান্ত আন্দোলনে যাওয়া হবে, চূড়ান্ত আঘাত হানা হবে। একবার ওয়ার অফ ম্যানুভারে প্রবেশ করলে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব না। এটি একমুখী রাস্তা।

উপযুক্ত সময়ের আগে এ পর্যায়ে প্রবেশ করা হলে বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। আন্দোলন ব্যাপক বাঁধা এবং নির্যাতনের মুখোমুখি হবে। সরকার অস্তিত্বের প্রতি হুমকি টের পেয়ে আন্দোলনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন বা নিদেনপক্ষে পঙ্গু করে ফেলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। বিপ্লবী আদর্শ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

ওয়ার অফ ম্যানুভারের পর্যায়ে ঢুকতে খুব বেশি দেরি হলে বিপ্লবের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলন ধীরেধীরে সংস্কারবাদী হয়ে গতানুগতিক রাজনীতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ার আশংকা থাকবে।

ওয়ার অফ পজিশন থেকে কখন ওয়ার অফ ম্যানুভারে প্রবেশ করার সঠিক সময় – এ সিদ্ধান্ত নেয়া ভ্যানগার্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের অন্যতম।

বিপ্লব প্রচেষ্টা ও বিপ্লবের উপাদান: **কিছু উদাহরণ**

কিছু উদাহরণ দেখলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে ইনশাআল্লাহ।

১। বাংলাদেশ আন্দোলন ৬২-৭১

বাংলাদেশ আন্দোলন ছিল ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা, শেখ মুজিব এবং ছাত্রলীগের অন্তর্ভুক্ত অল্প ক'জন নেতার পরিকল্পনা। ৬০-এর দশক থেকে সিরাজুল আলম খান স্বাধীন বাংলাদেশের লক্ষ্য নিয়ে ছাত্রলীগের মধ্য বাছাই করা কিছু সদস্যকে (তোফায়েল, আব্দুর রাজ্জাক, আরেফ) নিয়ে কাজ শুরু করে। গড়ে উঠে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে বিপ্লবী একটি ধারা। যার নেতৃত্বে ছিল 'কাপালিক' বলে খ্যাত সিরাজুল আলম খান। পরে এটি স্বাধীনতার 'নিউক্লিয়াস' নামে পরিচিতি পায়। এ নিউক্লিয়াস-কেই পরবর্তীতে 'বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' বা বিএলএফ হিসাবে ডাকা হয়। বিএলএফের গেরিলা উইং হিসাবে ১৯৭১ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল সুজান সিং উবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভারতের দেরাদুনে গড়ে তোলা হয় 'জয়বাংলা বাহিনী', যা সাধারণের কাছে 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিত ছিল।

সিরাজুল আলম খান, শেখ মুজিবকে অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে সামনে রেখে একটি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলে। এইজন্য সে কাজে লাগায় ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ এবং আওয়ামী লীগের তৃণমূলের বিভিন্ন অংশকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে রেখে তারা জনগণকে প্ররোচিত করতে থাকে। আগরতলা ষড়যন্ত্র, ছয় দফা, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০ এর নির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কথা আমরা মুটামুটি সকলে জানি।

পরে পাকিস্তানী হুকুমাত ২৫শে মার্চের ম্যাসাকার করলে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি শুরু হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, ২৬শে মার্চ জিয়াউর রহমানের বিদ্রোহের ঘোষণা আওয়ামী লীগ-নিউক্লিয়াসের হিসাবের বাইরে ছিল। ৯-১০ বছর ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রচারণা, জাতীয় নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের অবস্থান, ৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল এবং ২৫শে মার্চ পাকিস্তানীদের ক্র্যাকডাউন—এই সবকিছুর ভিত্তিতে জিয়া পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ করে। কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষনা দেয়। ইস্টে বেঙ্গল রেজিমেন্টের অন্যান্য অংশও বিদ্রোহ করে। এভাবে যুদ্ধের মধ্যে আরেকটি অংশ ঢুকে যায়, পাকিস্তান আর্মিতে থাকা বাঙালি অফিসাররা।

এটি ছিল আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগ আর ভারতের হিসাবের বাইরে। এই অফিসারের যারা বিদ্রোহ করে, বিভিন্ন সেক্টর গঠনের মাধ্যমে যুদ্ধের নিয়ন্ত্রন নেয়। বাঙালি অফিসাররা যুদ্ধ শুরু করার বেশ কয়েক মাস পর মুজিববাহীনি ময়দানে আসে। এটি ভারতের হিসাব উলোটপালোট করে দেয়। যুদ্ধকালীন সময়েই এ বিষয়টি নিয়ে সেক্টর কমান্ডারদের সাথে আওয়ামী লীগ, মুজিববাহিনী তথা ভারতীয় গোয়েন্দাদের টানাপোড়ন চলে। একারণেই আওয়ামী লীগ এবং ভারত শুরু থেকেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ১৫ই আগস্টের ঘটনার পর এই অনুভূতি আরও তীব্র হয়।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার মাধ্যমে ছাত্রলীগের মধ্যে থাকা নিউক্লিয়াস একটি পর্যায়ে সফলভাবে মেরুকরণকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায়। পাকিস্তানী ক্র্যাকডাউনের পর স্বাধীনতার চেতনা পর্যাপ্ত জনসমর্থন পায়।

৭১-এর ঘটনাকে ৯ বছরের আওয়ামী লীগের জাতীয়তাবাদি আন্দোলনের পর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের বিদ্রোহের দ্বারা শুরু হওয়া যুদ্ধের ফলাফলও বলা যায়। বাঙালি অফিসারদের বিদ্রোহ ও আওয়ামী লীগের আন্দোলনকে একে অপরের পরিপূরক বলা যায়।

উপাদান:

- ভ্যানগার্ড: শেখ মুজিবকে সামনে রেখে সিরাজুল আলম খান, এবং তার নেতৃত্বে 'নিউক্লিয়াস', ছাত্রলীগের একাংশ, আওয়ামী লীগের কিছু অংশ
- বিপ্লবী শ্রেনী: ছাত্র সমাজ, শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী।

- তাদের গড়ে তোলা গণসংগঠন: ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, মফস্বল অঞ্চলে তৃণমূল আওয়ামী লীগের কিছু অংশ।
- সশস্ত্র অক্ষ: জিয়াউর রহমান, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, যা পরে মুক্তিবাহিনী-তে পরিণত হয়।

লক্ষণীয় বিষয় -

৭১-এ ৯-১০ বছর ধরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী প্রচারণা, জাতীয় নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের অবস্থান, ৭০-এর নির্বাচনের ফলাফল এবং ২৫শে মার্চ পাকিস্তানীদের ক্র্যাকডাউন—এই সবকিছুর ভিত্তিতে পরিস্থিতির প্রবাহে জিয়াউর রহমান স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিদ্রোহ করে। অন্যরাও পরে যোগ দেয়। কাজেই ৭১- ঘটনায় সামরিক অক্ষের উপর ভ্যানগার্ডের সরাসরি নিয়ন্ত্রন ছিল না। এই অসামঞ্জস্যের ফলাফল দেখা যায় ৭২ থেকে ৭৫ পর্যন্ত চলা অস্থিরতায়।

২। ৭৫ এর ৭০ নভেম্বর 'সিপাহী জনতার বিদ্রোহ'

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সিপাহী-জনতার বিপ্লব, এই মডেলের আরেকটি উদাহরণ। ৭ নভেম্বরের পিছনেও মূল মাথা ছিল সিরাজুল আলম খান আর তার সাথে কর্নেল আবু তাহের।

জাসদ গঠিত হয় ১৯৭২ সালে। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের যে অংশটি 'নিউক্লিয়াস' গড়ে তুলেছিল তাদেরই একটি অংশ জাসদ গঠন করে। তারা মনে করতো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আংশিক বিপ্লব হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এনে একে পূর্ণতা দিতে হবে। এই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়ে জাসদ অগ্রসর হয়। জাসদ গঠনের পর ছাত্রলীগ দুইভাগ হয়ে যায়, এক দিকে ছাত্রলীগ, অন্যদিকে ছাত্রলীগ-জাসদ।

একই সময়ে সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি মাওবাদী ধাঁচে জনযুদ্ধের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ গ্রহণ করে। অন্যদিকে জাসদ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতা দখলের উপায় হিসেবে গ্রহণ করে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানকে। মাও সে তুং-এর গেরিলা যুদ্ধের মডেলের বদলে বলশেভিক মডেলের অভ্যুত্থানকে তারা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যথার্থ বলে মনে করে।

এই জন্য জাসদ যেসব সংগঠন গড়ে তুলে,

- জাসদ-ছাত্রলীগ। বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানের লক্ষ্য সামনে রেখে জাসদের উদ্যোগে কলকারখানা শ্রমিক, গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং গরিব কৃষক, অফিস-আদালতে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। যেহেতু সিরাজুল আলম খানই শ্রমিক লীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সংগঠনকে ৭১ এর আগে শক্তিশালী করায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল, তাই এটি জাসদের জন্য সহজ ছিল।
- পাশাপাশি সশস্ত্র অক্ষ হিসাবে গড়ে তোলা হয় **'বিপ্লবী গণবাহিনী'**।
- সেনাবাহিনীর মাধ্যমে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকার পতনের লক্ষ্যে সেনাবাহিনীর ভিতরে গড়ে তোলা হয় গোপন সংঠন, **'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'**। উল্লেখ্য যে, তাহের 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' সাথে শুরু থেকে যুক্ত ছিল না। সৈনিকদের মাঝে সংগঠন গড়ে তোলার কাজ প্রথম শুরু করে মেজর জলিল।

গণবাহিনীর মূল লক্ষ্য ছিল সারা দেশে বিশৃংখলা, অরাজকতা, নৈরাজ্য সৃষ্টি করে সরকারের পতনের পথ ত্বরান্বিত করা। এ বাহিনী সেসময় সারা দেশে বিভিন্ন চোরাগুপ্তা হামলা চালায়। এসব কাজের জন্য মিডিয়া হিসাবে কাজ করে 'গণকণ্ঠ' পত্রিকা, যার সম্পাদক ছিলেন কবি আল মাহমুদ।

একদিকে গণবাহিনী থানা আক্রমণ, ব্যাংক লুট, পুলিশ এবং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা, খুন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে। অন্যদিকে, 'গণকণ্ঠ'সহ অন্য প্রচার মাধ্যম সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো হয়। অন্যান্য

সংগঠনগুলোর সদস্যদের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়েও প্রচারণা চলে। আর কর্নেল তাহের সেনাবাহিনীর ভিতরে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' বিস্তার ঘটাতে থাকে।

কেবল ঢাকা অঞ্চলে জাসদের তৎকালীণ বিভিন্ন অংশের সক্ষমতা সম্পর্কে জাসদ নেতা ও তাহেরের ভাই আনোয়ার হোসেন মন্তব্য করে,

> *"তেজগাঁও ও পোস্তগোলা শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে (আমাদের ছিল) ভালো সাংগঠনিক অবস্থা। প্রয়োজনে স্বল্প নোটিশে আদমজী থেকে হাজার হাজার শ্রমিককে ঢাকার রাস্তায় নামানোর ব্যাপারে সিরাজুল আলম খানের আত্মপ্রত্যয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগের শক্ত অবস্থান। ঢাকায় গণবাহিনীর প্রায় ছয়শত প্রশিক্ষিত সদস্য।"*

এর পাশাপাশি রাজনৈতিক দল হিসাবে জাসদ সমাজতন্ত্রের স্লোগান বাংলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালায়।

১৯৭৫ এর নভেম্বরের জাসদের পরিকল্পনা ছিল নিম্নরূপ:

- ৯ তারিখ হরতাল আহ্বান করা হবে। জাসদ নিয়ন্ত্রনে থাকা সংগঠনগুলো হরতালের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও শ্রমিক ফ্রন্টকে রাজপথে নামাবে।
- হাজার হাজার লোক রাজপথ দখলে নিবে।
- সেনাবাহিনীর ভিতরে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' অভ্যুত্থান করবে, ব্যারাক থেকে বের হয়ে আসবে।
- তাদের সাথে যোগ দিবে গণবাহিনী।

অর্থাৎ দুটি মাত্রা –

- একটি বেসামরিক: গণসংগঠনগুলো হরতালের মধ্য দিয়ে ছাত্র ও শ্রমিক ফ্রন্টকে রাজপথে নামাবে। হাজার হাজার লোক রাজপথ দখলে নিবে।
- আরেকটি সামরিক: সেনাবাহিনীর ভিতরে 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' আর বাইরে গণবাহিনী

কিন্তু সেনাবাহিনীর ভিতরে উত্তেজনার কারনে ৬ নভেম্বর রাতেই সৈনিকরা অভ্যুত্থান করবে বলে জানিয়ে দেয়। শেষমেশ ৭ই নভেম্বর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা 'মুভ' করে। সেনা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়।

তবে বেসামরিক অক্ষ ব্যর্থ হয়। জাসদের নিয়ন্ত্রিত গণসংগঠনগুলো রাজপথের নিয়ন্ত্রন নিতে ব্যর্থ হয়। জাসদ মারাত্মক ভুল করে আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখে।

বিপ্লবের পরিকল্পনা অনুযায়ী সামরিক মাত্রার সফলতার ফলে ৭ই নভেম্বরের সেনা অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফের সরকারের পতন ঘটে। কিন্তু জাসদের আর ক্ষমতায় যাওয়া হল না। কথা ছিল, জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের করে আনা হবে। তারপর জাসদের অফিসে তাকে এনে তাহেরদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হবে। পরে সিপাহী-জনতার এক সমাবেশ হবে। সেখানে বক্তব্য রাখবে জিয়া আর তাহের। কিন্তু মুক্ত হওয়ার পরে পরিস্থিতি পাল্টে যায়। জিয়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হতে এবং ভাষণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করে। তাহের বুঝতে পারেন জিয়া তাদের সাথে আর থাকছে না। সে অন্য কিছু করার জন্য পুনরায় সংগঠিত হবার চেষ্টা করে। কিন্তু জিয়া বুঝতে পারেন ক্ষমতায় টিকতে হলে জাসদকে সরাতে হবে। গ্রেফতার হয়ে যায় তাহেরসহ জাসদের সব নেতারা।

এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি –

- ভ্যানগার্ড: জাসদের নেতৃবৃন্দ
- বিপ্লবী শ্রেনী: মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া ছাত্র, পেশাজীবি, সেনাবাহিনীর সৈনিক, শহুরে মধ্যবিত্ত

- সংগঠন: ছাত্রলীগ-জাসদ, কলকারখানা শ্রমিক, গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং গরিব কৃষক, অফিস-আদালতে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন
- সশস্ত্র অক্ষ: বিপ্লবী গণবাহিনী, গোপন 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা'

জাসদের আংশিক সাফল্য ও পরবর্তী সম্পূর্ণ ব্যর্থতার কারণ কী ছিল?

- প্রথম কারণ, নিঃসন্দেহে বেসামরিক মাত্রায় কার্যকরী হতে না পারা। তারা রাজপথের দখল নিতে পারেনি। জাসদ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারেনি এমনকি নিজেদের বিভিন্ন সংগঠনকেও অভ্যুত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারেনি।
- এছাড়া জাসদের সাবেক সদস্যদের অনেকের মতে ব্যর্থতার পিছনে আরো দুটি কারণ হল, সময়ের আগে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং সময়ের আগে গণঅভ্যুত্থান করতে যাওয়া।

অর্থাৎ বৈপ্লবিক পরিস্থিতি তৈরি হবার আগে বিপ্লবে যাওয়া।

৩। জুলাই গণঅভ্যুত্থান

- ভ্যানগার্ড: ছাত্রশক্তির নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অ্যালাইরা
- বিপ্লবী শ্রেনী: ছাত্রসমাজ, বিরোধী দলগুলোর ছাত্রসংগঠন (শিবির, ছাত্রদল ইত্যাদি), বিরোধী দলের জনশক্তি,
- সংগঠন: বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলন,
- সশস্ত্র অক্ষ: নেই

তবে জুলাই জুড়ে চলা মেরুকরণের (যার মূল কৃতিত্ব হাসিনার লাগামছাড়া বক্তব্য এবং সহিংস নীতির) ফলে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারদের প্রভাবশালী সংগঠন রাওয়ার সদস্যরা আন্দোলনে সমর্থন দিয়ে রাস্তায় নেমে আসে ২ অগাস্টের দিকে। একই সাথে সেনাবাহিনীর মধ্যম ও নিম্ন সারির অফিসার/সৈনিকরা সাধারন জনগণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানায়, যা সেনাবাহিনীর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।

৪। ইরান বিপ্লব

ভ্যানগার্ড: খোমেনির নেতৃত্বাধীন কয়েক শো হার্ডকোর অনুসারী। মূলত ধর্মীয় নেতা, ছাত্র, এবং ইমামদের নিয়ে গঠিত একটি অগ্রগামী দল ছিল।

বিপ্লবী শ্রেণী: ধর্মীয় ছাত্র (তলাবে) এবং উলামা (ধর্মীয় নেতারা)। ধার্মিক বাজারী। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শহুরে জনগণ, যারা শাহের শাসনের বৈষম্য ও দমননীতিতে অতিষ্ঠ ছিল।

বিপ্লবী শ্রেণীর গড়ে তোলা সংগঠন: ঐভাবে সংগঠন ছিল না। তবে মসজিদ-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক, নির্দিষ্ট কর্মসূচীকে সামনে রেখে তৈরি হওয়া ইসলামিক ছাত্র সংগঠন এবং ধর্মীয় কমিটিগুলোকে এখানে রাখা যেতে পারে

সশস্ত্র অক্ষ: ছিল না। ইরানের শিয়া বিপ্লব একেবারেই নিরস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের বিরল উদাহরণ। সরকারের পতন এবং সেনাবাহিনীর পরাজয় বরণ ঘটে গণজোয়ারের কারণে। বিশাল মিছিল, ধর্মঘট, এবং বিক্ষোভের মাধ্যমে শাহের শাসন অচল করে দেওয়া।

৫। বলশেভিক বিপ্লব:

বলশেভিকদের প্রায় দুই দশকের দীর্ঘ প্রস্তুতির ফল। ছোট্ট কিছু পাঠচক্র থেকে শুরু করে অক্টোবর বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল, বিপ্লবী সাফল্যের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

ওয়ার অফ পযিশান (১৮৯৩–১৯১৭)

লেনিনের বিপ্লবী রাজনীতিতে সম্পৃক্ততা শুরু ১৮৯০-এর দশকের শুরুর দিকে। সেন্ট পিটার্সবার্গে লিগ অফ স্ট্রাগল ফর দ্য এম্যান্সিপেশন অফ দ্য ওয়ার্কিং ক্লাস দল গঠন করা হয় ১৮৯৫ সালে। এটি ছিল বিশটির মতো মার্ক্সিস্ট পাঠচক্রের সমন্বয়ে গঠিত ছোট্ট একটি দল। সদস্য সংখ্যা ৫০ এর আশেপাশে। এই দল, শ্রমিকদের নিয়ে পাঠচক্র করতো, লিফলেট-পুস্তিকা বিলি করতো, শ্রমিকদের বিভিন্ন আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতো এবং অংশগ্রহণ করতো।

আরএসডিএলপি গঠন (১৮৯৮):

১৮৯৮ সালে বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দল ও গোষ্ঠী একত্র হয়ে রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি (আরএসডিএলপি) গঠন করে। এর লক্ষ্য ছিল একটি একক বিপ্লবী প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা। তবে দলের ভেতর শীঘ্রই কৌশল ও সংগঠন নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়।

বলশেভিক বিভাজন (১৯০৩):

১৯০৩ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক-মেনশেভিক বিভাজন ঘটে। বলশেভিকরা কেন্দ্রীভূত, সুশৃঙ্খল ভ্যানগার্ড পার্টির উপর জোর দেয়, যেখানে মেনশেভিকরা গণতান্ত্রিক, গণভিত্তিক পার্টির পক্ষে ছিল। লেনিনের দল যদিও ছোট ছিল, তারা নিজেদেরকে বিপ্লবের আদর্শিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

১৯০৫ সালের বিপ্লব:

১৯০৫ সালের ব্যর্থ বিপ্লব ছিল বলশেভিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এই সময়ে সোভিয়েত বা শ্রমিক পরিষদের ধারণা প্রথম উদ্ভব হয়, যা ভবিষ্যতে বিকল্প ক্ষমতার কাঠামোর জন্য মডেল হিসেবে কাজ করে। যদিও এই বিদ্রোহ দমন করা হয়, এটি গণআন্দোলনের সম্ভাবনা এবং শ্রমিক-কৃষক জোটের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে।

ইস্ক্রা, প্রাভদা এবং প্রচারণার প্রসার (১৮৯৮–১৯০৫):

বলশেভিকদের তৎপরতার একটি বড় অংশ ছিল তাদের সংবাদপত্র ইস্ক্রা (এবং পরবর্তীতে প্রাভদা)-এর মাধ্যমে প্রচারণা চালানো। এটি দলীয় মতাদর্শ প্রচারের পাশাপাশি শ্রমিকদের সংগঠিত করত এবং রাষ্ট্রীয় শোষণের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করত।

প্রস্তুতি এবং নেটওয়ার্ক গঠন (১৯০৫–১৯১৪):

১৯০৫ সালের পর বলশেভিকরা আন্ডারগ্রাউন্ড কার্যক্রমে মনোনিবেশ করে। তারা শ্রমিক ইউনিয়ন ও গ্রামীণ কৃষকদের সাথে সংযোগ বৃদ্ধি করে এবং *প্রাভদা* পত্রিকার মাধ্যমে বিপ্লবী বার্তা ছড়িয়ে দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৭):

বিশ্বযুদ্ধ রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ সংকটকে গভীর করে তোলে। লেনিনের যুদ্ধবিরোধী অবস্থান শ্রমিক ও সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপক সমর্থন আদায় করে।

ওয়ার অফ ম্যানুভার (মার্চ–অক্টোবর ১৯১৭)

ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে জারশাসনের পতনের পর কৌশলগত যুদ্ধ শুরু হয়। প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট জনগণের অসন্তোষ সামাল দিতে ব্যর্থ হয়, এবং বলশেভিকরা পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়।

এপ্রিল ১৯১৭-এ লেনিন তার এপ্রিল থিসিস প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের সাথে কোনো আপোষ না করার ডাক দেন এবং "সমস্ত ক্ষমতা সোভিয়েতদের হাতে" দেওয়ার দাবি তোলেন। বলশেভিকরা পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং রেড গার্ডস নামে শ্রমিক মিলিশিয়া গঠন করে।

অক্টোবর বিপ্লবের সময় বলশেভিকরা সামরিক বিপ্লবী কমিটি (Military Revolutionary Committee বা MRC) গঠন করে, যা ছিল তাদের কৌশলগত পরিকল্পনা এবং সামরিক অপারেশনের কেন্দ্র। অক্টোবর ১৯১৭-এ পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত এই কমিটি গঠন করে। এর ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল পেট্রোগ্রাডকে বহিঃশত্রু আক্রমণ বা প্রতিপক্ষের বিপ্লববিরোধী পদক্ষেপ থেকে রক্ষা করা। তবে বাস্তবে, এই কমিটি বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়। লিয়ন ট্রটস্কি এই কমিটির নেতৃত্ব দেন। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েত, রেড গার্ড, এবং বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিকদের সাথে মিলে MRC সারা পেট্রোগ্রাডে সমন্বিত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

বলশেভিকদের নেতৃত্বে MRC সেতু, রেলস্টেশন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ডাকঘর, এবং টেলিগ্রাফ অফিসের মতো কৌশলগত স্থাপনা দখল করে। এই পদক্ষেপগুলি প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের কার্যক্রম অচল করে দেয়।

অক্টোবর ২৫-২৬ তারিখে, সামরিক বিপ্লবী কমিটির নির্দেশনায় রেড গার্ড ও ক্রনস্টাড নৌবাহিনীর সৈনিকরা উইন্টার প্যালেস দখল করে। এই আক্রমণ ছিল প্রভিশনাল গভর্নমেন্টের পতনের চূড়ান্ত ধাপ।

সামরিক বিপ্লবী কমিটি না থাকলে অক্টোবর বিপ্লব সফল হওয়া সম্ভব হত না।

এই ক্ষেত্রে আমরা দেখি –

ভ্যানগার্ড: বলশেভিক পার্টি, নেতৃত্বে ছিলেন লেনিন, ট্রটস্কি, এবং অন্যান্য শীর্ষ নেতারা।

বিপ্লবী শ্রেণী: শ্রমিক শ্রেণী (প্রলেতারিয়েত): পেট্রোগ্রাডের শিল্প শ্রমিকরা বিপ্লবের মূল চালিকাশক্তি।

এছাড়া, ওয়ার অফ পযিশানে সৈনিক ও নাবিকরা বিশেষ করে ক্রনস্টাড নৌঘাঁটির নাবিকরা বিপ্লবের সামরিক সমর্থনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কৃষক শ্রেণী বিপ্লবের সমর্থক কিন্তু সরাসরি অংশগ্রহণ সেভাবে ছিল না।

গণসংগঠন: পেট্রোগ্রাড সোভিয়েতসহ বিভিন্ন শ্রমিক পরিষদ, শ্রমিক ও সৈনিকদের প্রতিনিধি পরিষদ।

সশস্ত্র অক্ষ: রেড গার্ডস: শ্রমিক মিলিশিয়া, সামরিক বিপ্লবী কমিটি (MRC), ক্রনস্টাড নৌবাহিনী: সবচেয়ে সুসংগঠিত ও অভিজ্ঞ, পেট্রোগ্রাড গ্যারিসন: বিপ্লবীদের সমর্থনকারী সৈন্যরা।